কামাল লোহানী

বাঙালি সংস্কৃতি ও নব চেতনা

প্রবন্ধ

মুক্তিযুদ্ধের ৪৮ বছর পার হয়ে গেছে, তবু বাংলার সংস্কৃতি আপন মর্যাদায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারেনি। মাতৃভূমিতে যে লোকজ সংস্কৃতির বিপুল ভাণ্ডার এবং নানা রূপরসের মণিমুক্তা উজ্জ্বল অতীতকেও কেবল স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে কিন্তু আমরা কি নিজ গর্ব, সম্পদ নিদেনপক্ষে অহংবোধের কোনোটাকে প্রকাশ করতে পেরেছি? নাকি কেবলই শুনেছি বিশ্ব আধুনিক হয়েছে, বিজ্ঞান এগিয়ে গেছে তরতর করে, প্রযুক্তির সাফল্যে পৃথিবী যেন সমুজ্জ্বল। সুতরাং আমরা কিছু সেকেলে লোক সেই প্রাচীনকালেই পড়ে থাকতে চাইছি। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারছি না। তা তো বটেই, পারছি না। কারণ আমরা এ দেশের মানুষ নিজস্ব সম্পদে বলবান হওয়া সত্ত্বেও 'আমরা গরিব' বলে হীনম্মন্য মানসিকতায় ডুবে পরমুখাপেক্ষী হয়ে রয়েছি আমাদের শাসকগোষ্ঠীর কারণে। আর সে কারণেই আমরা জনগণ আমাদের মনোজগতে বিদেশি আগ্রাসী চক্রান্তকে রোধ করতে পারিনি।

দেশ তো পাকিস্তানিদের হাত থেকে পুনরুদ্ধার করেছি লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে, ৪৮ বছর পার হয়ে গেছে, তার পরও নিজস্ব সংস্কৃতিকে চর্চা করতে পারিনি আমরা। তার প্রধান কারণ অনৈক্য, নতুন করে তৈরি করা হয়েছিল, যার কুৎসিত রূপ আজও লক্ষ্য করছি আমরা। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভালো যদি তা হয় সততার সঙ্গে। তা না হলে সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষে পারস্পরিক বিরোধে পরিণত হয়। এমন অভিজ্ঞতাই তো হয়েছে এ পর্যন্ত। দেশের রাজনীতি যেমন দেশপ্রেমের বদলে সহিংস হয়েছে, ইতিহাস তেমনি বিকৃত হয়েছে, সংস্কৃতি মোটা দাগে পাল্টে গেছে আর চমৎকৃত হয়েছি বেলেল্লাপনার রংঢঙের ফলে বাংলার আপামর জনগণের মহান সংস্কৃতির যে উত্তরাধিকার, তাকে উপেক্ষাই করেছি। একবার চোখ বোলান না আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভাণ্ডারের দিকে, দেখবেন কত রত্নরাজি সেখানে উজ্জ্বল আভায় সমুজ্জ্বল হয়ে আছে, অথচ তাদের মধ্যে উপেক্ষা-অবহেলার মর্মন্তুদ বোবা-কান্না শোনা যাচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ যে জনগণ এই দেশটাতে শত্রুমুক্ত করতে জান বাজি রেখে লড়েছিল, সে আমরাই তো আছি, এ দেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অগণিত তরুণ প্রাণ নবপ্রজন্ম। তাদের নিয়েও কেন আমরা নিজ সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং ইতিহাসবিধৃত সংগ্রামকে নির্বাসিত করেই চলেছি? ব্রিটিশ এবং পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে কিংবা বাংলার ভাষাসংগ্রামে, মুক্তিযুদ্ধে রাজনীতির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রবল জোয়ারের সৃষ্টি করেছিল, সেই শক্তিশালী গণসংস্কৃতি আজ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। আর লোক ঐতিহ্য বলতে এ দেশের জারি, সারি, মুর্শিদী চটকা, পালাগান, ভাটিয়ালি ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা আলকম্প এমনকি যাত্রাপালাকেও কী যে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে তা বলা যাবে না। পরাধীনতার শৃঙ্খলে থাকার সময় আমরা তো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সংগ্রাম যেমন করেছি তেমনি একইভাবে সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছি। সেই উপাদানগুলো কোথায় গেল। ঐতিহ্যকেই বা লালন করছি না কেন?

আমাদের দেশে এখন ইলেকট্রনিক মিডিয়া যেভাবে বিস্তার লাভ করেছে, তাতে করে তো বাংলার ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি, লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে সংস্কৃতিকেও তুলে ধরার কি বিরাট সুযোগই না এসেছে। কিন্তু এসব একটির পর একটি গজিয়ে ওঠা টিভি চ্যানেল কি সেই দায়িত্ব পালন করেছে, নাকি কেবলই ব্যবসা করতে ব্যস্ত। গণমাধ্যমের যে জাতীয় দায়িত্ব সে সম্পর্কে সরকারও বোধ হয় এমন কোনো শক্তিশালী 'গণমাধ্যম নীতি' তৈরি করেনি। যার কারণে যে যার মতোন যা খুশি তাই করে যাচ্ছে। কোনো টেলিভিশন ঐতিহ্যবাহী উত্তরাধিকারকে তুলে ধরার জন্য চেষ্টা করছে, বলতে পারবেন পাঠক? হ্যাঁ, বাউল সংগীত কিংবা লোকগানের আসর তো হয়। কিন্তু দেখেছেন কি, তাতে কী কী পরিবেশন করা হয় এবং কেমন করে হয়? ইদানীং এক-আধটি চ্যানেলে জারি, ভাওয়াইয়া বা গম্ভীরা পরিবেশনের চেষ্টা হয় তো করে কিন্তু মানুষের লড়াই-সংগ্রামের গান, যা জাতিকে সংকটে সংঘবদ্ধ করেছিল, সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, এখনো যে গানের প্রয়োজন অপরিহার্য, সেই গণসংগীত-মুক্তিযুদ্ধের গান, লড়াইয়ের গানের কি কোনো 'চান্স' আছে কারও? বহু অনুরোধ, দাবি কত যে করা হয়েছে, অথচ কেন জানি না, এই দেশাত্মবোধক গান কিংবা গণসংগীতকে তাচ্ছিল্যই দেখিয়ে চলেছে চ্যানেল, বেতার ইত্যাদি। পরিবেশন করে না, তা চলবে না। মাঝেমধ্যে দিবসে উদযাপন করতে গেলে কিছু কিছু ওই ধরনের নাচ-গান পরিবেশন করা হয় বটে। কিন্তু প্রতিটি চ্যানেলেই কি মাতৃভূমির মুক্তিসংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাসের সংগ্রাম-সংক্ষুব্ধ দিনগুলোর বিবরণসহ যেসব গান সেসব সংগ্রামে সৃষ্টি হয়েছে তাকে কি পরিকল্পিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিবেশন করে নতুন প্রজন্মের সামনে সত্যিকার সংগ্রামের, কৃষক বিদ্রোহের, শ্রমিক আন্দোলনের, ভাষাসংগ্রামের, সাঁওতাল বিদ্রোহের কিংবা মুক্তিযুদ্ধের গণসংগীত, নৃত্যনাট্য কিংবা নাটক পরিবেশন করা যায় না? যায় নাকি, সংগ্রামের এসব কথা ও ইতিহাসকে তুলে ধরে টেলিভিশনে কথা বলার অনুষ্ঠান প্রয়োজনা করা? এতটা চটক আর চমক এবং কেবলই ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে নজর দিলে কি আধুনিক যুগে টেলিভিশনে অনুষ্ঠানমালা গ্রাহ্য হয়?

শুধু টেলিভিশনকেই বলি কেন? সরকার কিংবা বেসরকারি উদ্যোগই বা কতটা আর সংস্কৃতিচর্চা এবং বিকাশের ক্ষেত্রে? কেবল সংস্কৃতি সংগঠন কিংবা সংস্থা, প্রতিষ্ঠান তৈরি করে ছাত্রছাত্রী জুটিয়ে ধরাবাঁধা স্কুলিং করাটাই কিংবা দিবস উদযাপনে অনুষ্ঠান করাই কি সংস্কৃতিচর্চা? সংস্থা, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের কি কোনো দায়িত্ব নেই। এ ক্ষেত্রে একমাত্র একটি প্রতিষ্ঠানের নাম করা যায়, সে হলো 'ছায়ানট'। রবীন্দ্রশতবর্ষ উদযাপনকালে পাকিস্তানি সামরিক শাসনামলকে উপেক্ষা করে রবীন্দ্রচর্চার যে যাত্রা শুরু করেছিল, আজ পঞ্চাশ বছরে সেই মাত্র একটি সংগঠন

এখন বিশাল মহীরূহে পরিণত হয়েছে— কারণ তার জন্মও ওই প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই হয়েছিল এবং এর পেছনে আদর্শ চিন্তায় প্রগতিবাদী মানুষই এ ছাতার তলায় একত্রিত হয়েছিলেন। আজ ছায়ানট একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান যার অবকাঠামো প্রশিক্ষণ, চর্চা, প্রসার, ব্যাপক ও বিশাল। কিন্তু এই পূর্ব বাংলার প্রথম বাঙালি সংস্কৃতি উদ্যোগ ছিল বুলবুল একাডেমি আর ফাইন আর্টস। এর তো বয়স ৬৮ বছর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু যেভাবে শুরু হয়েছিল কিংবা পাকিস্তানআমলে আইয়ুব শাসনকালে প্রতিবাদে বাংলার লোক কাহিনিকে নৃত্যনাট্যে রূপ দিয়ে বাংলার সংস্কৃতিকে প্রথম তুলে ধরেছিল, তার আজ কী দুর্দশা? একে সংস্কৃতিসেবীদের হাত থেকে ব্যবসায়ী, শিল্পী, সংগঠকের হাতেই পড়ে ছিল প্রায় তিন যুগ। সর্বনাশটা করেছে সেই চিহ্নিত ব্যক্তিই। কোটারি আর সুবিধাভোগীর দল বা সিন্ডিকেট তৈরি করে তার রাজত্বকাল 'জমজমাট' করে রেখেছিল। অথচ এ প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়েছিল প্রখ্যাত গণশিল্পী বুলবুল চৌধুরীর স্মৃতি রক্ষার্থে। বুলবুলের জগদ্বিখ্যাত নৃত্য-উদ্যোগ ও সৃষ্টিকে ধরে রাখা, পরিবেশন করার কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করেনি। নতুন 'বিদ্রোহী' একদল সংগঠকের দায়িত্ব নিয়েছেন কিন্তু নানা জটিলতার কারণে এবং কিছুটা অন্তর্কলহের কারণে প্রতিষ্ঠানটিকে নতুন করে সর্বজনগ্রাহ্য করতে পারছে না। এখানে একটা কথা বলে রাখি, আদর্শ যদি স্থির থাকে, পরিকল্পিত কর্মসূচি নিয়ে এগোলে যে কোনো সংগঠন অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো ছায়ানট। এ উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিবাদী চরিত্রের কারণে রবীন্দ্রসংগীত আজ বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে, এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এমন যূথবদ্ধ মানসিক শক্তি নিয়ে আর কোনো প্রতিষ্ঠান আজ দাঁড়াতে পেরেছে? অথচ অসংখ্য প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠন কিন্তু ঢাকা শহরে এবং দেশের সর্বত্র বিরাজমান।

এ দেশে নাট্য আন্দোলন জবরদস্ত। পাকিস্তান হওয়ার পর যেমন চারুকলার বিষয়টি জয়নুল আবেদিনসহ তার সহযাত্রী কজনার সহযোগে আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল, তেমনি নাটক মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালে প্রবলভাবে অগ্রগতি সাধন করেছে। কারণ নাটক, পথনাটক, পোস্টার ড্রামা ইত্যাদি ছিল পাকিস্তানবিরোধী নাট্য আন্দোলনের হাতিয়ার। সমস্যা সংকটে নাট্যকর্মীরা ছিলেন পথসৈনিক। সে সংকল্প নিয়েই সংগ্রামে অর্জিত 'জাতীয় নাট্যশালা' আজ তাদের অহঙ্কারে পরিণত। সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নতুন প্রজন্মকে উদ্দীপ্ত করতে নাটক প্রধান উপজীব্য এবং দর্শকচিত্ত কেবল আলোকিত নয়, আন্দোলিত করতেও সক্ষম নাটকের কুশীলব। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শুধু বাংলা নাটক গ্রহণযোগ্যই হয়নি, নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার আন্তর্জাতিক থিয়েটারের বিশ্ব সভাপতি হয়েছেন। এ কি কম গৌরবের! চারুকলা কিন্তু পাকিস্তান আমল থেকেই টক্কর দিয়ে এগিয়ে চলছে এবং রাজপথের মিছিলে, দুঃশাসন লড়তে, ভাষাসংগ্রামে, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে কিংবা মুক্তিযুদ্ধের কী অপরিমেয় শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল চারুশিল্পীরা তা ইতিহাসে বিধৃত হয়ে আছে। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে, গণতন্ত্রের পক্ষে, সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ, মুক্তিযুদ্ধের অর্জনকে সাফল্যের পথে পরিচালিত করা নাট্য আর চারুকলা সমানতালে এগিয়ে চলেছে, বিস্তৃত হয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বিমোহিত এবং উদ্দীপিত করছে।

মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশে সাংগঠনিক পর্যায়ে সবচেয়ে বড় অর্জন হয়েছিল সংস্কৃতি ক্ষেত্রেই। আমরা সব মত ও আদর্শের কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষ বা সংগঠন সব একত্রিত হয়েছিলাম মহান ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের উদ্দেশ্যে। গঠিত হয়েছিল সংযুক্ত একুশে উদযাপন কমিটি। এই ব্যানারের তলায় আমরা সবাই সমবেত হয়েছিলাম। দেশে যখন কু, পাল্টা কু এসে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিধ্বস্ত করে দিচ্ছিল এমনই সময় কুওয়ালাদেরই একজন জেনারেল এরশাদ এসে সামরিক শাসনকালকে একনাগাড়ে দেশকে টেনে নিয়ে গেলেন আইয়ুব খাঁর মতোন। তবে আইয়ুবকে সরালেন তারই সেনাবাহিনীপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া কিন্তু জেনারেল এরশাদের স্বৈরাচারী শাসককে উৎখাত করেছিল এ দেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক শক্তির যৌথ আন্দোলন, যার প্রধান হাতিয়ার ছিল জনগণ। এই স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনে সক্রিয় শিল্পী সংগ্রামী সংগঠকরা এক হয়েই লড়েছিলেন, তারা তখন সংযুক্ত একুশে উদযাপন কমিটির নাম রাখলেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট। এ জোট নানা দিবসে সপ্তাহ কিংবা পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠানমালা আয়োজন ছাড়াও নানা আন্দোলনে সর্বাত্মক ভূমিকা পালন করেছে। বিজয় উৎসব, মুক্তিযুদ্ধের রজতজয়ন্তী, নববর্ষে প্রতিবাদী বর্ণাঢ্য মিছিল সংগঠিত করার কাজে অভূতপূর্ব ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু এত বছরের মধ্যে একবারই জাতীয় গণসংগীত সম্মেলন আয়োজন করেছিল। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে পদযাত্রা করে সারাদেশে প্রবল জাগরণ সৃষ্টি করেছিল। সেই সর্বজনীন সংগঠনটির কার্যক্রম কেবল দিবস উদযাপনেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। এ ছাড়া বরেণ্যজনের পরলোকগমনে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে লাশ এনে সবার শেষ দেখার সুযোগ করে দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

আরও মজার ব্যাপার হলো, স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক সংগঠন যেসব রয়েছে তারা সীমিত এলাকাতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু নিজস্ব সংগঠন ছাড়াও নতুন নতুন কতগুলো সংগঠন সৃষ্টি করা হয়েছে যেমন— সংগীত সংগঠন সমন্বয় পরিষদ, গণসংগীত সমন্বয় পরিষদ, ভাওয়াইয়াকে নিয়ে কয়েকটি সংগঠন গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রসংগীত, নজরুল সংগীত লোকসংগীত, বাউল নিয়েও একাধিক সংস্থার আবির্ভাব ঘটেছে। এগুলো যদি সংঘবদ্ধ একেকটি বিষয়ভিত্তিক সংগঠনে দাঁড়াত তাহলে জোরদার হতো এবং কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারত। সেদিন থেকে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন, পথনাটক পরিষদ যূথবদ্ধ শক্তি নিয়ে সংগ্রাম এবং নাট্যচর্চা চালিয়ে যাচ্ছে।

সংস্কৃতির একটি বিশাল অংশজুড়ে আছে নৃত্য। পাকিস্তান আমলে তেমন শক্তিশালী সংগঠন ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও নৃত্যশিল্পের ক্ষেত্রে যে সৃষ্টি এবং পরিবেশনা তা ছিল অসাধারণ। তখন ছেলেরা তেমন উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নাচে আসত না। নাচের মধ্যে অকারণে একটা মেয়েলি ঢং প্রচলিত ছিল। ফলে মেয়েরাই ছেলেদের অভাব পূরণ করত। কিন্তু দু-চারজন করে আসতে শুরু করেছিল। তবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর সংগীতের এ অধম ধারা বেশ জাগ্রত ও সমুন্নত হয়ে উঠেছিল। এখনো তো ভারতে কৃষ্টি নিয়ে কিংবা ব্যক্তি উদ্যোগ নিয়ে শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রভারতী ছাড়াও দিল্লিতে, মাদ্রাজে নানাভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ও গুরুসান্নিধ্যে শিক্ষালাভ করে দেশে থেকে যে নানা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করে কিংবা নিজেরাই স্কুল খুলে বসেন। তারাও গুরু-শিষ্য পরস্পর সৃষ্টি করে আনন্দ পান এবং শিক্ষার বিনিময়ে অর্থও উপার্জন করেন। সবাই না হলেও অনেকেই কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের লোকনৃত্যভিত্তিক বিপুল সম্পদ থেকে একটা মৌলিক নৃত্যধারার সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে।

কণ্ঠ আর যন্ত্রশিল্পীদের কোনো সংগঠন নেই, রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুল সংগীত ছাড়া। তাও রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে আবার বাদানুবাদ আছে। নজরুল সংগীত শিল্পীরা মনে হয় এখনো এক আছে। যন্ত্র সব সময়ই অনুষঙ্গ হিসেবেই কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু স্বতন্ত্র হিসেবে সেতার, সরোদ, বাঁশি, বেহালা ও তবলায় ইদানীং একটা চঞ্চলতা সৃষ্টি হয়েছে। সরোদ, বাঁশিতে বেশ সুনাম অর্জন করেছেন কজন। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক হলো শাস্ত্রীয় সংগীতের অবহেলা। ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ খাঁ, মুন্সী রইস উদ্দিন পণ্ডিত, বাবর মজুমদার, ওস্তাদ মিথুন দে, পিটার গোমেজ দেশে শাস্ত্রীয় সংগীতকে জনপ্রিয় করেন। বড় বড় শিল্পী জন্মেছেন এ দেশে। বাইরে থেকে এসেছেন। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, পণ্ডিত রবিশংকর, ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খান এরা তো ভারতে প্রসিদ্ধি পেয়েছেন কিন্তু জন্মগ্রহণ করেছেন এ বাংলায়ই। তারা সুউচ্চ শিখরে উঠেছিলেন বটে কিন্তু উত্তরসূরি তো আমরা তৈরি করতে কোনো সংগঠন, সংস্থা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পারিনি।

আবৃত্তি শিল্পেও বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল একদিন। এখন অনুষ্ঠিত সেই জমজমাট অবস্থা এবং উৎসবের আয়োজনও হয় না। যে উৎসব হয়, তা আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ একটা আছে বলে করতে হচ্ছে। দেশে অনেক সংগঠনও গড়ে উঠেছে। কিন্তু আবৃত্তির মান কতটা উন্নত হয়েছে নাটক, নাচের তুলনায়, তা ভেবে দেখতে হবে। ফতেহ লোহানী, গোলাম মুস্তাফার মতো আবৃত্তিকার কেউ বের হচ্ছেন না কেন?

বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ, চর্চা, উপস্থাপন এবং সংরক্ষণ করতেই হবে। সৃষ্টি করতে হবে নব চেতনা। এ ব্যাপারে সরকারকেই উদ্যোগ নিতে হবে। প্রকল্প নয়। প্রকল্প হলেই নয়ছয় হওয়ার ভয় থাকে। বাংলার লড়াকু মানুষের অমিততেজ বিক্রমের ইতিহাস, একাত্তরে প্রাণ বলিদানের হাজারো কাহিনী বলার আছে, নতুন প্রজন্মের কাছে। সেসব কাহিনি বাস্তবে তুলে আনতে হবে, তবেই পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যে লালিত সংস্কৃতি, সাহিত্য, ভাষা ও কৃষ্টি সব কিছুই লাভবান হবে।